Downloaded from: justpaste.it/27ew9

জীবন পাথেয়

আল-কুরআনঃমুসলিম জাতিসত্ত্বার প্রাণ

হাকিমুল ইসলাম ক্বারী মুহাম্মাদ তাইয়্যেব (রাহঃ)

==
=====

সম্মানিত বন্ধুগণ! আজকের এদিনটি আমাদের সবার জন্য সীমাহীন আনন্দ ও খুশীর দিন। কারণ আজই আমাদের ক'জন শিশু-কিশোর কুরআনের হেফজ শেষ করে পাগড়ী ও সনদ লাভ করেছে। তাদের কচি হৃদয়ে আল্লাহ্র কালাম অঙ্কিত হয়েছে। আর কুরআনে পাক যার হৃদয় স্থান পাবে সে মহাসৌভাগ্যবান বইকি। যেহেতু আল্লাহ্ পাকের বরকতময় সত্বা ও তাঁর মহান গুণাবলী নুরদীপ্ত ও জ্যেতির্ময়। বান্দা হলো নিরেট এক অন্ধকার পিণ্ড স্বরূপ। আর এ আধারাচ্ছন্ন মানব জীবনে আল্লাহ্র নূর ও জ্যোতির প্রতিফলন মানবজাতির জন্য নিসন্দেহে এক মহা সৌভাগ্য ও বরকতের উৎস ধারা। গভীর মনে চিন্তা করলে বুঝে আসবে যে, এ কুরআন মানব জাতির আত্মিক জিবনী ও প্রাণ শক্তি বটে। জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি করেছে এ কুরআন মানবধারায়। পৃথিবীর সকল জাতি গোষ্ঠীকে শিখিয়েছে সভ্যতা। অধপতিত আরব জাতিকে উন্নীত করেছে মানবতার স্বর্ণ শিখরে। এ বিষয়টির দিকে কুরআনে কারীমেরও ইঙ্গিত রয়েছেঃ

"হে নবী! আমি আপনার প্রতি আমার রুহ তথা নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি।" এরপর ইরশাদ হয়েছেঃ

'ইতিপূর্বে আপনি কিতাব ও ঈমান কি বিষয় তা জানতেন না।'

এখানে কুরআন সম্পর্কে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম, এ কুরআন আল্লাহ্ প্রদত্ত রুহ ও প্রাণ। দ্বিতীয়ত এ কুরআন জ্ঞান ও পূর্ণতার আধার। যার মর্ম এই দাঁড়াই যে, ইলম ও জ্ঞানই মানব জীবনের পূর্ণতার মূল নিয়ামক। আমরা নিজস্ব পরিভাষায় বলে থাকি, রুহ এক অদৃশ্য শক্তি। শরীর তাঁর পরশেই সচল হয়। শরীরের নিজস্ব চলৎ শক্তি নেই। রুহই হলো আসল চালিকা শক্তি। রূহের শক্তিতে শরীর সচল হয় আবার রুহ চলে গেলে শরীর পরিণত হয় মৃত লাশে। অনুরূপ কুরআনে কারীম আল্লাহ্ প্রদত্ত রুহ। বস্তুত এই রুহ মানব জীবনের সভ্যতা ও সজীবতার মুল নিয়ামক ও পরিচালক। আল্লাহ্ প্রদত্ত এই প্রাণ শক্তি আরব জাতির মাঝে প্রবিষ্ট হলে পর তারা সুসভ্যমণ্ডিত হয়। যে জাতির মাঝে মানবতাবোধ বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, বিশ্বের দরবারে যাদের ছিলো না এতটুকু সম্মান, রাখালিয়া আর বর্বতার ছিল যাদের একমাত্র পরিচয়। আর এই অসভ্য জাতিটিই কুরআন নামক অমীয় শক্তির পরশ পেয়ে জ্ঞান-গরিমায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হয়। রবের পরিচয় লাভে তারা এগিয়ে গেলেন সবার আগে। মরুচারী বলে খ্যাত বর্বর জাতি পরিচিত হলেন আল্লাহ্র নবীর প্রিয়তম জীবন সাথী হিসেবে। পূর্ব তাদের নামোল্লেখ করা হতো অবজ্ঞাভরে। আর এখন তারাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি প্রাপ্ত বান্দা হিসেবে চীর স্মরণীয়। কুরআনের আলোকছটায় তাদের মাধ্যমে পূর্বের আধার যুগের যবনিকাপাত হয়ে সূচনা হলো এক সর্বোত্তম যুগের। কুরআনের পরশে আরা পড়ে যায় স্থান, কাল অ পাত্র-সর্বস্থানে। এর পরশে সেই বর্বর মানুষগুলোর মাঝেও প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চার হয়। আর সে শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তারা বিশ্বময় ছড়িয়ে দেন সভ্যতার আলোক মালা। পৃথিবীর মৃত্যু-বৎ মানব পুরীতে তারা সৃষ্টি করেন প্রাণ হিল্লোল। পূর্বে এ

আরব জাতি বর্বরতার তিমিরে পড়েছিলেন অচেতন ভাবে। সে তিমিরাচ্ছন্ন অধপতিত জাতিটিই আজ জীবন সভ্যতার বিচারে সবার চেয়ে এগিয়ে। তারা কুরআনের শক্তি মত্তায় বলীয়ান হয়ে উত্থানের পথে অগ্রসর হলে পর রম পারস্যের গর্ব-অহমিকা লুটয়ে পড়ল তাদের পদতলে। তবে সাহাবা (রাঃ) গণের মনে বীরত্ব প্রদর্শনের কোন অভিলাষ ছিল না। বরং তাদের জিহাদ অ কুরবানীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, বিশ্ব সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রোথিত সব অনাচারের মূলোৎপাটন। তাই তাদের এ জিহাদ ও কুরবানী হয়েছে স্বার্থক।

কাইসার ও কিসরা নিপীড়িত মানুষের উপর খোদায়ীত্বের দাবী করেছিল। প্রজাসাধারণ তাদের দরবারে এসে নত মস্তক প্রণাম করতে বাধ্য ছিলো। কেউ খোদায়িত্বের দাবী করল শুধু মুখে মুখে। আর অনেকে তাঁর বাস্তবায়নপূর্বক প্রজাসাধারণের মাথায় তার বাস্তবায়নপূর্ব প্রসাধারণের মাথায় উপাস্য সেজে বসল। প্রজাসাধারণকে বাধ্য করল এবং অহংকারের সাথে বল্লো, তোমাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সমাধান করে নাও আমাদের উপাসনা করে। ফলে একমাত্র আল্লাহ্ পাকের জন্য শোভনীয় ও নির্দিষ্ট শব্দ গুলো রোম-পারস্যের দরবারে ব্যবহারের কুপ্রথা চালু হয়। প্রজাসাধারণ তাদের দৃষ্টিতে ছিল ক্রীতদাসতুল্য। তাদের অমানুষিক খাটুনীর বিনিময়ে অর্জিত সম্পদ কুক্ষিগত করে গুটি কতেক সামন্ত প্রভু নির্মাণ বিলাস মহল। আস্ম্য ইনসাফের ছিটে ফোটাও ছিল না সে সমাজে। এ শোচনীয় লগ্নে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কেবল রাজ্য জয়ের লক্ষ্যে যুদ্ধ করেন নি। ক্ষমতার লোভ-লালসাও তাদের ছিল না। একমাত্র আল্লাহ্র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে মানব সমাজে সাম্য অ ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পথ কন্টকমুক্ত করতেই শুধু তারা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন। তখন রোম-পারস্য এদু' অপশক্তি আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা হয়ে দাড়ায়। সাহাবাগণ (রাঃ) দেখলেন, এ অপশক্তিদ্বয়ের বিলুপ্তি সাধন পর্যন্ত ইসলামের পূণ্যময় আদর্শ বিশ্বজাহানে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তা না হলে মানব সমাজে প্রভু ও দাসের বিভক্তিও ঘুচবে না। তাই তারা বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠায় হাতে তুলে নেন সাম্য ও ইনসাফের পয়গাম। আর সে সাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পথে সর্বকঠিন বাঁধা সৃষ্টি করে রোম-পারস্য সাম্রাজ্যদ্বয়। ফলে সাহাবগণ (রাঃ) তাদের তখত-তাউসে হানলেন প্রচণ্ড আঘাত। ভেঙ্গে দিলেন বহু প্রতাপশালী সাম্রাজ্যের ভীত। সব বাঁধা দূর হওয়ার পরই ইড্ডীন হলো সাম্যের পতাকা। ইসলামের মুক্তিবাণী ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে। মানুষের দাসত্বের নিপিষ্ট নিঃস্ব-মানব সমাজ সুযোগ পেল প্রকৃত প্রতিপালকের বন্দেগী করার। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হল সাম্য। এল জীবনের স্পন্দন। কুরআনকে রুহ বলে আখ্যায়িত করার এই হল উদ্দেশ্য। আর রুহ হলো প্রাণের নাম, জীবনের মূলশক্তি। আর আল-কুরআন আত্মিক প্রাণের নাম। আর যে জাতি এ কুরআন নামক প্রাণের পরশ পাবে তারাই প্রকৃত জীবন্ত হয়ে উঠবে। আর যারা তা থেকে বঞ্চিত তারা হল মৃত্যুপুরীর পচা লাশ। এবার আমাদের ভাববার পালা।

মুসলিম উম্মাহর বর্ত্মান হালচালঃ

কুরআনের এ প্রাণ শক্তি মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিধ্যমান থাকাবস্থায় তারা শিরোন্নত জাতি হিসেবে ছিল স্বীকৃত। আর এই আত্মিক প্রাণ শক্তি হারানোর পর থেকে শুরু হল তাদের গ্লাণীকর জীবন।

মুসলিম উম্মাহ্ ঠিক ফুটবল সাদৃশ্য। ফুটবলের স্বাভাব হল, সেটা মাটিতে নিক্ষিপ্ত হলে উর্ধ্বমুখী লাফিয়ে উঠবে। পরিমাণ মত বায়ু ভরা থাকলে বলের লম্ফ বেশী উচ্চ হবে। তবে এটা রবারের গুণের নয়। বরং রবার দ্বারা তৈরী গোলকের মধ্যে ঠেসে দেয়া পাম্প বা হাওয়ার কারসাজি। বল ফুটো হয়ে গেলে রবারটা চুপসে যাবে। কারণ লম্ফ-ঝম্ফের মুল কারণ যে হাওয়া তা উড়ে গেছে। মুসলিম জাতির অবস্থাও তদ্রুপ। যাবত তারা কুরআনী প্রাণ শক্তিতে বলীয়ান এবং ঈমান সচেতন থাকাবস্থায় কুফরী চক্রের শত নিপীড়নেও নিস্তেজ হয়ে পড়েনি। বরং অত্যাচারের প্রচণ্ডতার মুখে তারা হয়েছে আরও সোচ্চার। আরও প্রতিবাদী। এ কুরআনী শক্তি হারানোর পর পড়ে রইল তার শুধু ফাকা খোলসখানা। সবাই ত এখন মূল ঈমানী শক্তি রহিত নির্জীব নিঃসাড়।

মুসলামানদের অভিযোগ, কুফরী চক্র আমাদের উপর নিপীড়ন করছে, জ্বালিয়ে দিচ্ছে ঘরবাড়ী। অত্যাচার চালাচ্ছে। মুসলমানরা আজ নিপীড়িত হচ্ছে বহু দেশে। এ অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হওয়ার কারণ আমরাই। দায়িত্বে দায়বদ্ধ আমরা অন্যরা নয়। যেমন ধরুন, কোথাও মৃত লাশ পড়ে থাকলে, সবার দায়িত্ব হলো

সেটা সমাধিস্ত করা। অন্যথায় বাতাসে পচা গন্ধ ছরাবে। পরিবেশ নষ্ট করবে। আর মৃতলাশের বিহীত করাটা কোন অন্যায় নয়।

মুসলিম জাতি আজ বিশ্ব নেতৃত্ব অর্জন করতে চাইলে কুরআনী শক্তি নেতৃত্ব অর্জন করতে চাইলে কুরআনী শক্তিতে উজ্জিবীত হতে হবে। তবেই কেবল অন্য কারো সাহস হবে না আমাদের প্রতি চোখ রাঙ্গিয়ে তাকানোর। নিঃসাড় হলে সবাই তার সৎকার করতে এগিয়ে আসবে। আমাদের অবস্থা এরূপ নয়কি? তাই ভুল সুধরিয়ে সঠিক পথে আসতে হবে।

সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত কারাঃ মুসলিম উম্মাহকেই খায়রে উম্মত বাশ্রেষ্ঠ জাতির খেতাবে ভূসিত করা হয়েছে। বিশ্ব-মানবকে তারা সন্ধান দিবে সঠিক পথের, সাড়া জাগাবো প্রতিটি জীবনে। আর বর্তমানের চিত্র তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইমাম সাহেবই অচেতন হয়ে পড়ে আছেন। মুক্তাদির নামাজ কোন রসাতলে যাবে তা সহজেই অনুমেয়। ইমাম প্রবরের ওযু নষ্ট হলে নামাযে মুক্তাদীর একান্ত খুশু-খুজু সবই বেকার। ইমাম প্রবরের নামাজ শুদ্ধ হলে পর মুকাদীরও শুদ্ধ হবে।

অনুরূপ আজ মুসলিম উম্মাহর মাঝে ইনসাফ, সততা, সহনশীলতার অভাব, ফলে পৃথিবী জুড়ে চলছে অনাচার, মুসলামানদের ওপর ভীন জাতির অত্যাচার। এই অর্নায়ের দায়-দায়িত্ব বর্তায় মুসলিম উম্মাহর উপর। আমাদের অনাচারের জন্য ভিন জাতি দায়ী নয়। নিজের সব কিছু সংশোধন ও পরিমার্জনের দায়িত্ব স্বয়ং ইমাম সাহেবেরই। মুক্তাদীর বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ করা অযৌক্তিক। আর করলেও তা হবে হাস্যস্পদ। তখন পাল্টা মুক্তাদীরাই বলবে, আরে আপনার কারণেই তো আমাদের নামাজ নষ্ট হল।

তাই শ্রেষ্ঠত্বের যোগ্যতা অর্জন করুন। কারণ আপনারাই শ্রেষ্ঠ উম্মত খেতাব প্রাপ্ত জাতি। আর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে জীবনে কুরআনের বাস্তবায়ন ও কুরআনের শক্তি স্বীয় সত্বায় প্রবিষ্ট করানোর মাধ্যমে।

আত্মশুদ্ধির সফল হাতিয়ার আল-কুরআনঃ

হযরত ইমাম মালিক (রাহঃ) বলেনঃ “উম্মতের প্রথমাংশ ও শেষাংশের সংশোধন শুধু একই আদর্শ দ্বারা সম্ভব।“ আর এ উম্মতের প্রথমাংশের সংশোধন হয়েছে আল-কুরআন দ্বারা। সাহাবী (রাঃ)-গণের লাইব্রেরীতে এবং সংগ্রহে আলকুরআন ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ ছিল না। এ মহা গ্রন্থ ভিত্তিতেই সূচীত হয়েছিল তাদের উন্নতি ও উত্থান। অতএব উম্মতের প্রথম যাত্রীদল যে আদর্শের আলোকে সংশোধিত হয়েছেন উম্মতের শেষ দলকেও এ আদর্শের আলোকেই সংশোধিত হতে হবে। সে আদর্শ আল-কুরআন-যে কুরআন জীবন পরিচালনার মূল নিয়ামক।

আল-কুরআনের এ প্রাণ শক্তিতে উম্মাত যতদিন উজ্জীবিত ছিল, ত্তদিন তারা ছিল জীবন্ত-প্রাণবন্ত। যে জীবন এত উর্বর অ সজীব ছিলো যে, বদর রণাঙ্গণে মাত্র তিন’শ তেরজন মুজাহিদ আরবের ভাগ্য চাকার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। আজ সে শক্তি নেই। তাই সংখ্যায় একশত কোটি হওয়া সত্ত্বেও কুফরী চক্র আমাদের উপর মোড়লী করছে। পৃথিবীর চিত্র পাল্টে দেয়ার সে শক্তি নেই আজ আমাদের মাঝে।

সার কথাঃ জিবন-জাগরণের স্পন্দন সৃষ্টি করা আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য। আল-কুরআনের বাস্তবায়ন ছাড়া অবচেতন ভাব কাটবেনা। হাজারও কৌশল চালু করুন, তাতে কাজ হবে না। এ কুরআনই আপনাদের শক্তি ও সভ্যতার উৎস। আল কুরআন দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিচ্ছেঃ

“তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু’শর মুকাবিলায়।“(আনফালঃ৬৫ তম আয়াত)

এ প্রচণ্ড শক্তিমত্তা এলো কোত্থেকে? বিশজন দুইশতের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ী হবে। এটা কোন কথার কথা বা প্রশংসাগাথা নয়। বরং সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক সংঘটিত বাস্তব ঘতনা। বস্তুত ইসলামে সংখ্যাধিক্যের গুরুত্ব নেই। বরং আত্মিক প্রাণশক্তিই সেখানে বিবিচ্য। একজন শক্তিমান হাজারও দুর্বলকে টেক্কা দিতে পারে। তা কি অবাস্তব?

খালিদ বিন ওলীদ (রাঃ)-এর বীরত্বঃ মাহান বিন ওয়ালীদ সাথে মুসলমানদের লড়াই হয়। মুজাহিদ

কমান্ডারদের মধ্যে খালিদ বিল ওয়ালিদও একজন। মুজাহিদদের সংখ্যা দশ হাজার আর শুশমন ষাট হাজার। শত্রু বাহিনীর এই সৈন্য সংখ্যার কথা মুসলিম বাহিনীর জানা ছিল না। তাই শত্রুর অবস্থান অ সৈন্য সংখ্যার তথ্য সংগ্রহের জন্য ৩০০ মুজাহিদ বাছাই করা হল। এ গ্রুপের কমাণ্ডার হলেন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ। তিনি সেনাপতি ওবায়দুল্লাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-কে বলেন, তিন'শ ব্যক্তির দরকার নেই। আমার সাথে মাত্র ত্রিশজন মুজাহিদ দিন। তা-ই যথেষ্ট। সেনাপতি বললেন, 'আপনার ঈমানী শক্তিকে মুবারকবাদ! তবে পৃথিবী যেহেতু একটি উপকরণ নির্ভরতান্ত্রিক জগৎ তাই অন্তত ষাট জন মুজাহিদ নিয়ে যান।' বহু অনুরোধের পর হযরত খালিদ এতে রাজী হলেন। তিনি ষাটজন মুজাহিদকে নিয়ে অনুসন্ধানে বের হলেন। বাকী সকল মুজাহিদ ছাউনীতে অবস্থান করেন।

মাইল কয়েক যাওয়ার পর খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) জানতে পারেন, সম্মুখেই শত্রু ছাউনী। তাদের সংখ্যা ষাট হাজার। শক্তি ও সংখ্যা বলে তারা মুসলিম বাহিনীর পাঁচগুণ বেশী।

তখন হযরত খালিদ (রাঃ) তাঁর মুজাহিদ দলকে লক্ষ্য করে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। বললেন, 'আমার মুজাহিদ ভাইয়েরা! শত্রু বাহিনী আমাদের সম্মুখে অবস্থান করছে। এখন আরও মুজাহিদের জন্য পিছনে সংবাদ দেয়ার প্রয়োজন আছে? আমার মতে, পিছনে কোন সংবাদ না দিয়ে এই ষাটজন নিয়ে ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ি ওদের মুকাবিলায় এ ক'জনই যথেষ্ট।।'

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বললেন, তা হোক। আমরা তো এসেছি শাহাদাতের তামান্না নিয়ে। তাই শত্রুর সংখ্যাধিক্যে ভিত হব কেন। পিছনে সংবাদ দেয়ার প্রয়োজন কি!

খালিদ (রাঃ) মাত্র ষাট জন মুজাহিদকে সারী বেঁধে দাড় করালেন। অপরদিকে সুমজ্জিত ষাট হাজার শত্রু সেনা। ইরানী সেনাপতি মাহান অগ্রসর হয়ে বল্লো, ওহে খালিদ! আমাদের ধারণা ছিল, মুসলমানরা বেশ বুদ্ধিমান। এখন তোমাদের দেখে ভারী বোকা মনে হচ্ছে। ষাট হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র ষাট জন যুদ্ধ করতে এসেছ! তোমারা ফিরে যাও। দয়া-দাক্ষিণ্যে তোমাদের ভরে দিব। প্রত্যককে দু'মন খেজুর, অর্থ-কড়ি যা চাও সব দিব। এতে সুখে সাচ্ছন্দে তোমরা দিন কাটাতে পারবে। এই ভুখা-নাঙ্গা মানুষগুলোকে নিয়ে এসেছ কেন? কেন অযথা অত্যাচার করছ নিজেদের উপর। নিজ দেশে ফিরে যাও। তাতেই তোমাদের মঙ্গল।

খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) মাহানকে লক্ষ্য করে বল্লেন, ওহে মাহান! তুমি কমাণ্ডার না বক্তা। লজ্জা হয়না তোমার, যুদ্ধের ময়দানে বক্তৃতা দিয়ে ভিরুতার উপর প্রলেপ দিচ্ছ! আসলে তোমরা যুদ্ধ করতেই জাননা। খালিদ (রাঃ)-এর কটাক্ষবান শুনে মাহান চরম রে উঠে। ষাট হাজার সৈন্যকে নির্দেশ দেয়, এই ষাটজনকে বন্দী কর!

নির্দেশ পাওয়া মাত্র ষাট জন মুজাহিদের উপর ষাট হাজার সৈন্য ঝাপিয়ে পড়ল। তখনই ফাক গলিয়ে ষাটজন নির্ভীক মুজাহিদ ঢুকে পড়েন ওই বিশাল সীন্য সারীর ভিতরে। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মুসলিম মুজাহিদদের আর দেখা গেল না। ময়দান জুড়ে শুধু তরবারীর ঝনঝন শব্দ হচ্ছিল। তিন ঘন্টার ভিতরে ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। ষাটজন মুজাহিদ বিজয়ী মাল্য ছিনিয়ে আনলেন ষাট হাজার সৈন্য থেকে। উপরন্তু কাফেরদেরকে বহুদুর পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়ে তারা ছাউনীতে ফিরে এলেন।

ওদিকে দশ হাজার মুজাহিদ জেহাদে ঝাপিয়ে পড়ার সূতীব্র বাসনা নিয়ে অপেক্ষা করছেন। আর মাত্র ষাট হাজারকে কুপোকাত করে ফিরে এলেন মাত্র ষাট জনে।

ঈমানী শক্তিই মুল নিয়ামকঃ মাত্র দশজন এক হাজারের উপর বিজয়ী হওয়াও কল্পকাহিনী নয়। এটা এক ঐতিহাসিক বাস্তাবতা। সাহাবায়ে কেরাম এখনও শত্রুর সংখ্যাধিক্যে আর অস্ত্র বলে হিম্মত হারাননি। বলতে চাই যে, কিসের এ শক্তি। কোত্থেকে এল তা। হ্যাঁ, এ শক্তি নবুওয়তের নূর ও বরকত। এ শক্তি ঐশী ও কুরআনী শক্তি সাহাবাদের মনে প্রবিষ্ট হয়ে ব্যক্তিকে করেছে হাজারের বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ। আর এ প্রাণ শক্তি উড়ে গেলে মুসলমান পরিণত হয় একটি নিসাৎ গোস্ত পিণ্ডে। তাই শুধু তীর তলোয়ার ও দৈহিক শক্তি বলে আপনাদের বিজয় লাভ হবে না। বস্তুতঃ ঈমানী শক্তি বলেই তীর, তলোয়ার চালাতে হবে, তবেই বিজয় আসবে। পক্ষান্তরে

সশস্ত্র অথচ মনোবলহীন ব্যক্তির তরবারী বেকার। মনোবল থাকলে তবেই অস্ত্র দিয়ে কাজ হবে। অন্তরই মুল চালক আর হৃদয় মন শক্তিশালী হয় ইমান ও তাওহীদের পরশে। ঈমানের পরশেই মন শক্তিশালী হয়ে উঠে। সার কথা জীবন সঞ্চারলণ ও মৃত প্রাণে যিন্দেগীর ছোয়া এনে দেয়াই আল-কুরআনের কাজ।

অনুবাদঃ আহমাদ আল-ফিরোজী